ক্যাটরিনার পর

ধেয়ে আসছে দুর্নীতি

হাসান মূর্তাজা

পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে দুর্যোগ হলে মার্কিনিরা ছুটে যায়। সেটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক কিংবা মানবসৃষ্ট। মানবিক সাহায্যের কথা বলা হয়। উদ্দেশ্য অবশ্য আরো কিছু। দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর পুনর্গঠনের পালা শুরু হলে মার্কিন ঠিকাদাররা থাকে সামনের কাতারে। আপদকালে মার্কিন ত্রাণগ্রহণকারী দেশটির তখন কিছুই বলার থাকে না। পুনর্গঠনের নামে মার্কিন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানগুলোর হরিলুট তাদের চেয়ে চেয়ে দেখতে হয়। ইরাক কিংবা আফগানিস্তানে ঠিক এমনটিই ঘটছে। সম্ভবত একেই বলে 'কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।'

এতকাল দেশের বাইরেই রক্তচোষার এই কাজটি করেছে মার্কিনিরা। ক্যাটরিনার পর এবার নিজ দেশেই হরিলুটের আসর জমিয়েছে, ঠিকাদার ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। পুনর্গঠন কাজে অংশ নিতে যতরকম দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া যায়, তারা নিচ্ছে। কারণ, বিপুল লাভের হাতছানি।

ক্যাটরিনার মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মার্কিনিরা আগে কখনো দেখেনি। ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যায় ইংল্যান্ডের সমান আকৃতির নিউ অর্লিয়েন্স পুরোপুরি বিধ্বস্ত। ৫০ লাখ জনসংখ্যার শহরটি এখন ভুতুড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ব্যর্থ বুশ তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। সমালোচনা এড়াতে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন কর্মকাণ্ডের। আর এতেই ঠিকাদার ও নির্মাতারা আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। কংগ্রেস ইতিমধ্যে ৬ হাজার ২০০ কোটি ডলার ছাড় করেছে পুনর্গঠন কাজের জন্য। সব মিলিয়ে এই ব্যয় ঠেকতে পারে ১০ হাজার কোটি ডলারে। এরই মধ্যে মিলিয়ন ডলারের কাজ বিনা দরপত্রে বিভিন্ন কোম্পানিকে দেয়া হয়েছে।

সংস্কার কাজ পেতে ঠিকাদাররা জোর লবিং করছেন। এই লবিং কাজের নেতৃত্বে আছে 'কেন্দ্রীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা'র সাবেক দুই পরিচালক। অন্যান্য নামকরা লবিস্ট এবং উপদেষ্টারা তো আছেই। কাজ পেতে যেসব ঠিকাদার লবিং করছে তাদের মধ্যে স্থানীয় ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার কোম্পানি যেমন আছে, তেমনি আছে ফ্লুয়োর কর্পোরেশন

ক্যাটরিনা বিধ্বস্ত নিউ অরলিয়েন্সে পুনর্বাসন কাজ শুরু হয়েছে

কিংবা হ্যালিবার্টনের মতো বৃহদাকৃতির প্রতিষ্ঠান। অনেকেই বিনা টেন্ডারে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। কাজ পেতে তদবির করছে এমন অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগও রয়েছে। যেমন, হ্যালিবার্টন।

বুশ প্রশাসনে তদবিরের কাজ করছে এমন একজন কনসালটেন্ট জো এম অ্যালবাহ। জো অ্যালবাহ প্রেসিডেন্ট বুশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি ২০০০ সালে বুশের নির্বাচনী প্রচারণার ম্যানেজার ছিলেন। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা বা 'ফেমার' পরিচালক ছিলেন ২০০১-০৩ সাল পর্যন্ত। ফেমার আরেক সাবেক পরিচালক এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বন্ধু জেম লি উইটও তদবির কাজে অংশ নিচ্ছেন। দু'জনে বিভিন্ন ঠিকাদার ও নির্মাতা কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে আশ্বাস দিয়েছেন কাজ পাইয়ে দেয়ার। এজন্য এসব কোম্পানি লাখ লাখ ডলার খরচ করে তাদের 'পরামর্শক' হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। অ্যালবাহ কাজ করছেন হ্যালিবার্টনের (ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এক সময় যার পরিচালক ছিলেন) সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'কেলগ ব্রাউন অ্যান্ড রুট এবং 'শ' গ্রুপের' হয়ে। অ্যালবাহ অবশ্য বলেছেন, তিনি প্রশাসনের লাল ফিতার বেড়াজাল টপকাতে এই দুই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করছেন মাত্র।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, জাতীয় দুর্যোগের সুযোগে মুনাফালোভী কোম্পানিগুলো ফায়দা লোটার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে এবং এর সঙ্গে বুশ প্রশাসনের জড়িত থাকার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। এমনটাই হয়েছিল ইরাকে। ইরাকের তেলকূপগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছিল ডিক চেনির আশীর্বাদপুষ্ট 'হ্যালিবার্টন' এবং টেক্সাসভিত্তিক কোম্পানিগুলো।

কোনো রকম দরপত্র আহ্বান ছাড়াই গৃহনির্মাণের কাজ দেয়া হয়েছে ফ্লুরোরকে। এ গ্রুপ পেয়েছে ২০ কোটি ডলারের দুটি কাজ। হ্যালিবার্টনকে দেয়া হয়েছে তিনটি মিসিসিপি নৌ-স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। এছাড়া বেকটেল অনানুষ্ঠানিক চুক্তিতে গৃহনির্মাণের কাজ পেয়েছে। ফেমা বলছে, দুর্যোগ মুহূর্তে দরপত্র আহ্বান এবং বাছাইয়ের সুযোগ ছিল না। কিন্তু সরকারের ব্যয় পর্যবেক্ষণ করে এমন একটি অলাভজনক সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ডেনিয়েল ব্রায়ান বলছেন, 'আমরা ইরাকে দেখেছিলাম গণিমতের মাল নিয়ে কাড়াকাড়ি। এখানেও দেখি সেই দশাই চলছে।'

দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্গঠন কাজ তদারকির দায়িত্ব যে সংস্থার সেই 'ফেমা'র নিজের সংস্কার দরকার সবার আগে। দুর্যোগ মোকাবেলার কাজে গাফিলতির অভিযোগে সংস্থাটির পরিচালক মাইকেল ডি ব্রাউনের চাকরি গেছে। নতুন পরিচালক থ্যাড অ্যালেন এখনো কাজ বুঝে উঠতে পারেননি। শুধু পরিচালক না, ফেমার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকেই চাকরি হারিয়েছেন। দুর্যোগ মুহূর্তে সাহায্যের বদলে তারা পালিয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া অভিযোগ রয়েছে, 'ফেমা'র কম্পিউটার সিস্টেমও কাজ করছে না। মোদ্দা কথা, ফেমা নিজেই দুর্যোগ-আক্রান্ত। এই অবস্থায় দরপত্র ডেকে, বাছাই করে যোগ্য প্রতিষ্ঠানের হাতে কাজ দেবে, এমন অবস্থায় নেই প্রতিষ্ঠানটি। সুযোগ বুঝে কোপ বসাচ্ছে মুনাফালোভী ঠিকাদাররা।

বুশ যে কতটা বেকায়দায় আছেন তা বোঝা গেছে জাতিসংঘের ৬০তম অধিবেশনে। আল-কায়েদা বা ইরাক নিয়ে খুব বেশি উচ্চবাচ্য করেননি তিনি। নরম সুরে কথা বলেছেন, অন্যের সহানুভূতি প্রার্থনা করেছেন। অন্যদিকে বুশের বিরোধী শিবির আক্রমণের ভাষা তীব্র করছে। এর সঙ্গে যদি যোগ হয় পুনর্গঠন কাজের দুর্নীতি, বুশের পক্ষে তা সামলে ওঠা সহজ হবে না।

নির্বাচনে কী আসে যায়

জামান আরশাদ

এ লেখা যখন পাঠকের হাতে পৌঁছাবে, তখন আফগানিস্তানে পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়ে গেছে। ফলাফলও বেরিয়ে যেতে পারে। তবে আফগানিস্তানের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার খোঁজ-খবর রাখেন, এমন ব্যক্তিদের কাছে নির্বাচনের ফলাফল কী হলো, কারা জিতলো, কারা এগিয়ে-কারা পিছিয়ে এসব এখন আর বিবেচনার বিষয় নয়। দেশটিতে একটা নির্বাচন হয়েছে এটাই বড় কথা। নির্বাচন হয়েছে না বলে আমরা বলতে পারি একটা নির্বাচনের আয়োজন করা গেছে এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাচনটি হয়েছে। সিকি শতাব্দী পর সেখানে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো।

এই নির্বাচনকে ঘিরে বিবিসি, সিএনএন, এপি, এএফপি, রয়টার্স খুবই সোৎসাহে সংবাদ পরিবেশন করে। তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, নির্বাচন উপলক্ষে গোটা আফগানিস্তানে আনন্দের বন্যা বয়ে গেছে। গণতন্ত্রের পতাকাতলে শামিল হবার জন্য নাকি ধর্মীয় নেতা, উপজাতি নেতা, কমিউনিস্ট নেতা সবাই কোমর বেঁধে লেগে পড়েছেন। পুরো আফগানিস্তানে এখন বইছে গণতন্ত্রের হাওয়া। শহর, শহরতলী, প্রত্যন্ত গ্রাম সব জায়গা ছেয়ে গেছে প্রার্থীদের রঙচঙে পোস্টারে। আমজনতার মাঝেও নাকি নির্বাচনী উত্তেজনা। নির্বাচন নিয়ে সে দেশে এতটা উৎসাহ থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। আর যেহেতু তারা সংবাদ পরিবেশন করেছে, তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হচ্ছে। আবার এ প্রশ্নও করা যেতে পারে, যে দেশের সমাজ-জীবনে এখনো সুস্থির অবস্থা ফিরে আসেনি, যে দেশে সাধারণ মানুষ মৌলিক অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত, সেখানে একটা নির্বাচন নিয়ে কীভাবে এতোটা উৎসবের বন্যা বয়ে যায়? আর উৎসব করতে তো টাকা লাগে। দরিদ্র আফগানরা এত টাকা কোথায় পাচ্ছে?

যাই হোক, আমরা ধরে নিলাম আফগানিস্তানে খুবই উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন হয়েছে। খুবই উৎসাহের সঙ্গে আফগানরা নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। মার্কিন সমর্থকরা সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য পশ্চিমাসংবাদ মাধ্যম এরকম ইতিবাচক প্রতিবেদন করেছে তা আমরা বিশ্বাস করলাম না। আমরা এও বিশ্বাস করলাম না, এ নির্বাচনে কোনো অনিয়ম-কারচুপি হয়নি।

আমরা অনেকেই জানি, ১৯৮০-এর দশকে

ভঙ্গুর নিরাপত্তার মাঝে এই নির্বাচন গুরুত্বহীন

সর্বশেষ সেখানে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর দেশটির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনা। সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগানদের যুদ্ধ, মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে মৌলবাদী তালেবানদের মতা দখল, মার্কিন হামলার মুখে আবার তালেবান শাসনের পতন, এরপর অন্তবর্তী সরকার গঠন, জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং মার্কিনপন্থি হামিদ কারজাইর প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ।

তবে কারজাই সরকার মতায় আছে বেশ কয়েক বছর। কিন্তু এখনো সে দেশের সমাজ-জীবনে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তালেবানরা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে। আবার মার্কিন সেনা সদস্যরাও তালেবান দমনের নামে সাধারণ মানুষকে ধড়পাকড় করছে। আর এ পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নির্বাচন।

এ নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬ হাজার। সোভিয়েট বাহিনীর পক্ষে লড়াই করা সাবেক যুদ্ধবাজ কমিউনিস্ট নেতা, তালেবান সরকারের সাবেক কর্মকর্তা, মানবাধিকার কর্মী সবাই ছিলেন। সবচেয়ে নজিরবিহীন হলো, এ নির্বাচনে অংশ নেন ৫৮২ জন নারী। তার মানে এই নয়, নারীরা শিক্ষা-দীক্ষা ও সচেতনতায় খুব এগিয়ে গেছে। নারীরা যে তিমিরে ছিলো, সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। আফগানিস্তানে নতুন সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেন্টে ৩০ শতাংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এ জন্যই এতো নারী প্রার্থীর ছড়াছড়ি।

এ নির্বাচনে ভোটার ছিল ১ কোটি ২৪ লাখ। গত অক্টোবরে প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে এই ভোটার সংখ্যা পাক্কা ২০ লাখ বেশি। সোয়া কোটির কাছাকাছি ভোটার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের ২৪৯ জন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করবেন। একই সঙ্গে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন ৩৪টি প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্যরা। কারা হবেন পার্লামেন্টের উচ্চকরে সদস্য সেটা চূড়ান্ত করবেন এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই।

সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, তালেবান সমর্থক জঙ্গিরা বহুভাবে চেষ্টা করে এই নির্বাচন ঠেকাতে। না পেরে এখন বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করে, তাদের হামলায় মারা গেছে কয়েকশ আফগান ও মার্কিন সৈন্য, অসংখ্য সাধারণ মানুষ।

যদিও এরপর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়। সেনা সংখ্যা ২ হাজার বেড়ে বর্তমানে সেখানে ১১ হাজার সৈন্য নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। আর দক্ষিণ ও পূর্বের দেশগুলোতে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল ২০ হাজার মার্কিন সৈন্য। নির্বাচন উপলক্ষে সৈন্য সংখ্যা আরো ৭০০ বাড়ানো হয়।

নারী প্রার্থীদের ওপর বিভিন্নভাবে হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়। অনেক প্রার্থীকে হত্যার হুমকি দিয়ে টেলিফোন করা হয়। দেওয়া হয় উড়ো চিঠি। ৩২ বছর বয়সী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ও পূর্বাঞ্চলীয় খোস্ত প্রদেশ থেকে প্রার্থী মাহবুবা সাদত ইসমাইলি প্রচার চালাতে পারেননি। গ্রামের বয়সী লোকরা তাকে বলেছেন, তাদের নারী প্রার্থীর দরকার নেই। কারণ তালেবান ও আল-কায়েদা জঙ্গিরা নারী প্রার্থীদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ জন্য মাহবুবা তার পক্ষে প্রচার চালানোর জন্য পুরুষ প্রার্থী পাঠান। যে দেশের এই অবস্থা সেখানে কীভাবে নির্বাচন নিয়ে উৎসবের বন্যা বয়ে যায় তা আমাদের মাথায় আসে না।

পার্লামেন্ট নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না, তা নিয়ে আমরা এখনই বলতে পারছি না। তবে এরই মধ্যে সোভিয়েট বিরোধী মুজাহিদ গ্রুপের নেতা গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কারজাইর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনুস কানুনি এবং সাবেক কমিউনিস্ট জেনারেল ও ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অব আফগানিস্তানের প্রধান নুরুল হক ওলোমিসহ অনেকেই অভিযোগ করেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। কারজাই সমর্থকরা ভোট চুরির পরিকল্পনা করেছে। তারাই এগিয়ে থাকবেন।

অনেকেরই মনে আছে বা অনেকেই জানেন, গত বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কতটা হাস্যকরভাবে কারজাইকে বিজয়ী করা হয়েছিল। পার্লামেন্ট নির্বাচনেও হয়তো তার পছন্দের প্রার্থীদের বিজয়ী করা হয়েছে।